দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 SEP 2015 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ছাত্র সন্ত্রাসী, রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়

জাফর ইকবালকে ছাত্রাবস্থা থেকেই চিনি। বয়সে আমরা প্রায় কাছাকাছি। দু'জনের পেশাও এক। তফাৎটা হচ্ছে- আমরা তেমন নির্বিরোধী নই, রাস্তায় স্লোগান দিয়েই বৃদ্ধ হয়েছি। একেবারে নির্বিরোধী মানুষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ জাফর ইকবাল। তার পিতা শহীদ। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ তিনি। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি তিনি অনুগত। তার স্ত্রী ইয়াসমিন হকও আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত। জাফর ইকবালের স্ত্রী হিসেবে নন, তিনি নিজেই আলাদা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। জাফর ইকবাল থেকে তিনি বরং বেশি রাজনৈতিক এবং সোচ্চার। এটি অবশ্যই তার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচক দিক। এই দম্পতির সঙ্গে দেখা হলে, ইকবালের থেকে ইয়াসমিনের সঙ্গেই আমাদের কথা হয় বেশি।

সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্তৃক যে তারা আক্রান্ত হয়েছেন তা রাতের খবরের আগে জানতে পারিনি। টেলিভিশনে এই দৃশ্য দেখে আমারও মনে হয়েছে, ৪৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কী করলাম? পড়িয়েছি বটে তাদের, কিন্তু মানুষ করতে পেরেছি কী? আমাদের শিক্ষকতা জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এই।

হ্যাঁ, আমি এ দোষ অনায়াসে চাপাতে পারি রাজনীতিবিদদের ওপর, যারা এসবকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, গত কয়েক বছর দেখেও না দেখার ভান করেছেন। এটা জানি, বাংলাদেশে লজ্জাবোধ থাকলে রাজনীতি বা ব্যবসা করা যায় না এবং তারা অভ্যস্ত নিজের দায় অন্যের ওপর

মুনতাসীর মামুন

চাপাতে, তারপরও আমি তাদের ওপর দায় চাপাব না। কারণ আমাদের ভোটেই রাজনীতিবিদরা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, সরকার গঠন করেছেন।

সরকারী দলের ছাত্রগুণ্ডা কর্তৃক শিক্ষক পেটানো এটি প্রথম কোন ঘটনা নয়। এই ঐতিহ্য আমরা সৃষ্টি করেছি আইয়ুব-মোনায়েম আমলে। স্বাধীন হওয়ার পর ভেবেছিলাম এ ধরনের কুৎসিত ঘটনা আর ঘটবে না কিন্তু ঘটেছে, রাজনীতির ধরন না বদলালে তা চলবে।

আইয়ুব আমলে যা ঘটেছিল তা এখন বিস্মৃত। ঘটনাটা ঘটেছিল অর্থনীতির জনপ্রিয় ও মেধাবী অধ্যাপক আবু মাহমুদকে নিয়ে। তার বিভাগের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা। বিভাগের আরেক অধ্যাপক কে. টি. হোসেনও চেয়ারম্যান হতে চান। সিনিয়রিটি নিয়ে বোধহয় দ্বন্দ্ব ছিল। হাইকোর্টের মামলায় অধ্যাপক মাহমুদ জিতেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী, রায়ের দিন-ই সরকারী ছাত্র সংগঠন এনএসএফ তাঁর ওপর হামলা করে। তিনি আহত হন। সেই সময় এনএসএফ ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। ওই সময়কার অনেকে যারা এনএসএফ করতেন পরবর্তীকালে তারা বিএনপির সমর্থক হন। কিন্তু ওই আক্রমণ সমাজে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, এনএসএফ আর কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাদের নেতাদের অনেকে নিহত হন। এই ছাত্র সংগঠনের আর চিহ্নই শেষে রইল না। ছাত্রজীবনে আমরা এনএসএফ আতঙ্কে থাকতাম।

স্বাধীনতার ঠিক পরপর সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মাথায় সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন পিস্তল ঠেকিয়ে পদত্যাগ করতে বলে। এর আগে আইয়ুব আমলে কমিউনিস্ট হিসেবে মোনায়েম খান তাকে চাকরিচ্যুত করেন। ওই সময় সমাজবিজ্ঞানে এমন দু'জন শিক্ষক ছিলেন যাদের যোগ্যতা ছিল সরকারী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তখন অনুমান করা হয়েছিল, তারাই ছাত্রলীগের গুণ্ডা শাখাকে নিয়োগ করেছেন। পরে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক জাহাঙ্গীরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে আসেন। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এরপর বহুদিন ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোন আনুকূল্য পায়নি।

জিয়ার আমলে ছাত্রদল তাদের গুণ্ডামি শুরু করে। তারা রিভলবার কোমরে গুঁজে টিউটোরিয়ালে আসত। আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন এক ছাত্রদল নেতা পরীক্ষার হলে গুলি ছুড়েছিল। শিক্ষকদের নানাভাবে তখন নাজেহাল করা হয়েছিল।

এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস শুরু হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে নাজেহাল করা শুরু করে। আমার রুমে রাতে তালা খুলে বোমা রাখা হয়েছিল। ওই সময় পুলিশ সেনারাও শিক্ষকদের ওপর হামলা করে। অবস্থা এমন হয় যে, এরশাদের মতো মানুষকেও তার ছাত্র সংগঠন বাতিল করতে হয়।

জামায়াত-বিএনপি আমলে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে রাজশাহীতে ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যায় জড়িত হয়ে পড়ে ছাত্ররা, হ্যাঁ, এবং শিক্ষকরাও। শিক্ষকরা সরাসরি হত্যায় নয়, তবে শিবির ও ছাত্রদলকে প্রণোদনা তারা অনেক ক্ষেত্রে যুগিয়েছে। এছাড়া সারাদেশে হত্যা, খুন, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে শিবির ও ছাত্রদল। শিবির অবশ্য জিয়াউর রহমানের আমলে রগকাটা রাজনীতি শুরু করেছিল। এখন ফিরে এসেছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। শাহজালালে নয় এর আগেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ শিক্ষকদের নাজেহাল করে আসছে নিয়মিত। এটি কোন গোপন কথা নয়।

অন্যদিকে আমাদের বা শিক্ষকদের কথা বলি। সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের মতো শিক্ষকদের ইন্টেগ্রিটিতেও ফাটল ধরেছে। এরশাদ আমল থেকে এর শুরু বলতে হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সব সময়ই ছিল, পৃথিবীর সব দেশেই আছে। এই দ্বন্দ্ব প্রধানত সৃষ্টি হয় আদর্শগত কারণে এবং বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপত্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এরশাদ আমলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতির কারণে পদ ও অর্থের প্রলোভন। এই সময় থেকে শিক্ষকদের নিয়োগ ও প্রমোশনের ক্ষেত্রেও শৈথিল্য দেখানো শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার যোগ্যতা বিচার্য হয়নি; নিশ্চল আনুগত্য প্রাধান্য পেয়েছিল। এরপর প্রত্যেক আমলে এই ধারা প্রবলতর হয়েছে। শিক্ষকদের নৈতিকতাও প্রশ্নের সম্মুখীন। ধরা যাক, অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর কথা। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, তার প্রথম বইটি আমিই প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। অবশ্য, সে সময় তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক। পরে, পদের ও প্রতিপত্তির কারণে তিনি দল বদল করেন। তাতেও আপত্তি নেই। বিএনপি আমলে তাকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। রাতের বেলা তালা খুলে উপাচার্যের চেয়ারে বসে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তারপর ঘটে শামসুন্নাহার হলের সেই বিখ্যাত ঘটনা। তখন থেকেই ভিসি ও ডিসির পার্থক্য ঘুচতে শুরু করে। তাকে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে পদত্যাগ করতে হয়। এখন শুনছি না দেখছি, নাকি সরকারী দলের একজনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার বিভাগ তাকে প্রফেসর এমেরিটাস করার প্রস্তাব রেখেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবিএম হবিবুল্লাহ, আহমদ শরীফ, মনতাজুর রহমান তরফদার, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরকে প্রফেসর এমেরিটাস দূরের কথা সুপার নিউমারি শিক্ষকও করেনি [অনেক ক্ষেত্রে]। আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর ক্ষেত্রে এখন আর প্রতিবাদ হয়নি। সুতরাং, শিক্ষকদের নৈতিক বল হ্রাস পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর কারণ, নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রমোশনের ক্ষেত্রে সেই মান আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।

এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ যেনতেন প্রকারে হয়। এখন চাকরি পাবার ক্ষেত্রে কঠিন মানদণ্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু রেজাল্ট ভাল করা আর ক্লাসে পড়ানো ভিন্ন ব্যাপার। নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির সমন্বয় করা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভিন্ন আমলে। সেই দোষ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপালে হবে না। সরকারী প্রতিনিধি থাকেন সিন্ডিকেটে। আগে উপাচার্য নিয়োগ সরাসরি সরকার দিলেও যিনি ভিসি হতেন তার ব্যক্তিত্ব থাকত। সামরিক আমল থেকে সেই মানদণ্ড বিপর্যস্ত হতে থাকে। এখন বেছে বেছে যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয় সমাজেই অপরিচিত। সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক যেখানে নিয়োগের প্রথম শর্ত, সেখানে যিনি উপাচার্য হন তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না। শিক্ষকরাও তাকে গুরুত্ব দেয় না। যদি তিনি নির্বাচন করে উপাচার্য হন তাহলে তিনি নির্ভর করেন তার দলের ওপর। এ এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শুধু নিয়োগ নয়, ছুটিছাটা, নিয়োগ, সুযোগ সুবিধা- সবকিছু আবারও ভালভাবে পর্যালোচনা করে আইনের পরিবর্তন করে তা সময়োপযোগী করা বাঞ্ছনীয়।